দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 APR 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

202

বেসরকারী শিক্ষকদের দাবি

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই জোর দিয়েছে। বার্ষিক বাজেটেও সিংহভাগ অর্থ শিক্ষার উন্নয়নে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কিন্তু তবু শিক্ষার মানোন্নয়ন হচ্ছে না। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা এবং পরিবেশ দূষণ মুক্ত হচ্ছে না। এর কারণগুলো খুঁজে বের করা দরকার। অনুসন্ধান করে তার প্রকৃত সমস্যাগুলো নিয়ে নতুন করে ভাবা প্রয়োজন। কেবলমাত্র শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করলেই শিক্ষার উন্নয়ন এবং শিক্ষিতের হার যে বৃদ্ধি হবে- এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

তবে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পটভূমি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে, শিক্ষাখাতের ব্যয় বরাদ্দ যা রাখা আছে তার বেশিরভাগ ব্যয় করা হচ্ছে উচ্চ শিক্ষারখাতে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাখাতেই যেখানে অধিক ব্যয় করা দরকার সেখানে মাত্র ৪০ শতাংশ ব্যয় হচ্ছে।

ফলে অবস্থাটা যা দাঁড়াচ্ছে তা হচ্ছে সর্বজনীন শিক্ষা তথা প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক তথা উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে কোন যোগসাজস থাকছে না। প্রসঙ্গক্রমে বিশ্ব ব্যাংকের একটি সমীক্ষার উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। উক্ত সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করে পরে এসব দেশ দ্রুত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারে নজর দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় সফল হওয়ার ফলেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত সমীক্ষায় আরও উল্লেখ্য আছে যে, বেশি বেশি অর্থ ব্যয় করলেই শিক্ষার উন্নয়ন ঘটে না। কিভাবে শিক্ষাখাতে খরচ করা হবে সে বিষয়টিই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। গত বৃহস্পতিবার সারাদেশে বেসরকারী স্কুল ও কলেজ শিক্ষকগণ পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বেতন স্কেল চালু, ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন, চাকরির নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সুযোগের সমতা বিধান করার দাবি নিয়ে প্রতীক ধর্মঘট পালন করেছে। বেসরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের ধর্মঘটের সাথে সাথে এ সকল প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। গত বুধবার ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত তাদের দাবি মানা না হলে ১৮ এপ্রিল থেকে অবিরাম ধর্মঘট পালন করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (নজরুল ইসলাম গ্রুপ) ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন (মন্টু-হাসান)ও ১৬ এপ্রিল (শনিবার) থেকে সমাবেশ করবেন। তাদের দাবি শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণ, ম্যানেজিং কমিটিতে কর্মচারীদের সদস্যপদ দান। তাই অবস্থাটা প্রকট আকার ধারণ করার আগেই এ সম্পর্কে সরকার ও ধর্মঘটীদের মধ্যে একটা সম্মানজনক নিষ্পত্তি হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি।

আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী স্কুল-কলেজের ন্যায় বেসরকারী স্কুল-কলেজের গুরুত্ব অসীম। বরং এ কথা বলা যায় যে, সরকারী স্কুল-কলেজ সীমিত বিধায় দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই বেসরকারী স্কুল-কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। তাই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকাকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। দেশে ১১ হাজার বেসরকারী হাই স্কুল ও ৬শ' ৪০টি কলেজ রয়েছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানে পৌনে দু'লাখ শিক্ষক কর্মরত আছেন।

সে কারণেই বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া দরকার এবং সেই সাথে সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মাঝে সৃষ্ট বৈষম্য যতদূর সম্ভব দূর করার প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে এখানে বিআইডিএস-এর একটি নির্ভরযোগ্য তথ্য উল্লেখ করা দরকার। উক্ত তথ্যে উল্লেখ আছে যে, বাংলাদেশের বাজেটে শিক্ষাখাতের জন্য যে বরাদ্দ থাকে, তা মূলত শিক্ষকদের বেতন ও অবকাঠামো খাতেই ব্যয় হয়। শিক্ষা বাজেটের ৩৬ শতাংশ ব্যয় হয় অবকাঠামো খাতে, ৪৫ শতাংশ ব্যয় হয় শিক্ষকদের বেতন বাবদ এবং মাত্র এক শতাংশ ব্যয় হয় শিক্ষাসূচী প্রণয়ন ও উন্নয়ন খাতে।

এই তথ্য অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা বাজেটের অর্থ শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য খরচ না হয়ে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই খরচ হয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈষম্য। ফলে মূল যে উদ্দেশ্য শিক্ষা বিস্তার বা সম্প্রসারণ তা ব্যাহত হচ্ছে।

দেশের শিক্ষা বিস্তারে বিশেষত সর্বজনীন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জোর দেয়া জরুরী বিধায় বেসরকারী শিক্ষকদের দাবির প্রতি সরকারের অবশ্যই সুদৃষ্টি দিতে হবে।